তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প

(গল্পগ্রন্থ – কিন্নর দল)

মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব

তারানাথ তান্ত্রিকের প্রথম গল্প আপনারা শুনিয়াছেন কিছুদিন আগে, হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং তাহার দ্বিতীয় গল্পটি যে বিশ্বাস করিবেন এমন আশা করিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গল্পটি এমন অদ্ভুত যে সেটি আপনাদের শুনাইবার লোভ সম্বরণ করাআমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

জগতে কি ঘটে না-ঘটে তাহার কতটুকুরই বা আমরা খবর রাখি? "There are more things in Heaven and Earth, Horatio" ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব এই গল্পটি শুনিয়া যান এবং সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া ডিস্‌মিস্‌ করিবার পূর্বে মহাকবির ঐ বহুবার উদ্ধৃত, সর্বজনপরিচিত, অথচ গভীর উক্তিটি স্মরণ করিবেন এই আমার অনুরোধ।

তবে যিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট, এই স্থূল জগতের বাহিরে অন্য কোন সূক্ষ্ম জগৎ, কিংবা ভূতপ্রেত কিংবা অন্য কোন অশরীরী জীব কিংবা অপদেবতা-উপদেবতার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসবান নহেন, তিনি এ গল্প না-হয় না-ই পড়িলেন?

ভূমিকা রাখিয়া এখন গল্পটা বলি।

সেদিন হাতে কোন কাজকর্ম ছিল না, সন্ধ্যার পূর্বে মাঠ হইতে ফুটবল খেলা দেখিয়া ধর্মতলা দিয়া ফিরিতেছিলাম। মোহনবাগান হারিয়া যাওয়াতে মনও প্রফুল্ল ছিল না—কি আরকরি, ধর্মতলার মোড়ের কাছেই মট লেনে (নম্বরটা মনে নাই তবে বাড়িটা চিনি) তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ি গেলাম।

তারানাথ একাই ছিল। আমায় বলিল—এস এস হে, দেখা নেই বহুকাল, কি ব্যাপার?

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময়ে ঘোর বৃষ্টি নামিল। তারানাথ আমায় এ অবস্থায় উঠিতে দিল না। আমি দেখিলাম বৃষ্টি হঠাৎ থামিবে না, তারানাথের বৈঠকখানায় বসিয়া আমরা দুজনে। বৃষ্টির সময় মনেকেমন এক ধরনের নির্জনতার ভাব আসে—বৃষ্টি না থাকিলে মনে হয় শহরসুদ্ধ লোক বুঝি আমার ঘরে আসিয়া ভিড় করিবে, কেহ না আসিলেও মনের ভাব এইরূপ থাকে, কিন্তু বৃষ্টি নামিলে মনে হয় এ বৃষ্টি মাথায় কেহই আসিবে না। সুতরাং আমার ঘরে আমি একা। তারানাথের ঘরে বসিয়াও সেদিন মনে হইল আমরা দু-জনে ছাড়া সারা কলিকাতা শহরে যেন কোথাও কোন লোক নাই।

সুতরাং মনের ভাব বদলাইয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাও নামিল। জীবনের অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি উভয়েরই জাগিল। ঘোর বৃষ্টিমুখর আষাঢ় সন্ধ্যায় আমরা মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয়, ল্যাংড়া আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার, চৌরঙ্গীর মোড়ে ওবেলাকার বাস্‌-দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানারূপ কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ কোন্‌ সময় নারীপ্রেমের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম।

তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হইলেও শুকদেব যে নয় বা কোন কালে ছিল না, এ-কথা পূর্বের গল্পটিতে বলিয়াছি। আশা করি, তাহা আপনারা ভোলেন নাই। নারীর সঙ্গে সে যে বহু মেলামেশা করিয়াছে এ-কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাহার মুখ হইতেই এ বিষয়ে কিছু রসাল অভিজ্ঞতার কথা শুনিব, এরূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে এ সম্বন্ধে যে অসাধারণ ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বর্ণনা করিল, তাহার জন্য, সত্যই বলিতেছি, আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

আর একটা কথা, তারানাথকে দেখিয়া বা তাহার মুখে কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চাপিয়া রাখিয়াছে, অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্রের কথাবার্তা বলিতে গিয়া যেন কি একটা বলি বলি করিয়াও বলে নাই, আজ বুঝিলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনীই সে আমার কাছে কেন কাহারও কাছে বলে নাই, হয়তো সেগুলি ঠিক বলিবার কথাও নহে—কারণ সে কথা বলা তাহার পক্ষে কষ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করা মাত্র। তা ছাড়া আমার মনে হয়, লোককে সে-সব গল্প বিশ্বাস করানোও শক্ত।

বলিলাম—জ্যোতিষী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে অনেক—কি বলেন?

তারানাথ বলিল—অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত। প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার। এখন কিন্তু সেটা স্বপ্ন বলে মনে হয়—শোনো তবে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—কোন ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না, প্রথম প্রেম হল একটি মেয়েরসঙ্গে, সে মারা গেল—এই তো? ও ঢের শুনেছি। তারানাথ হাসিয়া বলিল—ঢের শোন নি! শোন—কিন্তু বিশ্বাস যদি না কর তাও আমায় বলবে।এরকম গল্প বানিয়ে বলতে পারলে একজন গল্পলেখক হয়ে যেতুম হে!...দু-একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া একথা কারও কাছে বলিনি।

ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর হইতে তারানাথের বড় মেয়ে চারু ওরফে চারি দু-পেয়ালা গরম চা ও দুখানি করিয়া পরোটা ও আলুভাজা আনিল। চারি দশ বছরের মেয়ে, তারানাথের মতই গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল, মুখ-চোখ মন্দ নয়। আমায় বলিল—কাকাবাবু, লেসের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না? চারির কাছে কথা দিয়া রাখিয়াছিলাম, ধর্মতলার দোকান হইতে তাহার উল-বোনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নকশা কিনিয়া দিব। বলিলাম—আজ ফুটবলের ভিড় ছিল, কাল এনে দেবো ঠিক।

চারি দাঁড়াইয়া ছিল, তারানাথ বলিল—যা তুই চলে যা, দুটো পান নিয়ে আয়—

মেয়ে চলিয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ছেলেপিলের সামনে সে-সব গল্প—চা-টা খেয়ে নাও, পরোটাখানা—না, না, ফেলতে পারবে না, ইয়ং ম্যান তোমরা এখন—খাওয়ার বেলা অমন—ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেলো—

চা পানের পরে তারানাথ বলিতে আরম্ভ করিল :

বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলীর অদ্ভুত কাণ্ড সেবার গল্প করেছিলাম, তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কাণ্ডের পরেই।

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল তার পর থেকে। নিজের চোখে যা দেখলুম, তা তো আর বিশ্বাস না করে পারি না। এটা পাগলীর কথা থেকে বুঝেছিলুম, পাগলী আমায় ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল।ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে। গুরু খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজলে কি হবে, ও-পথের পথিকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।

এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেড়িয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হল। প্রথম, ধুনি—জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ব্যবসাদার, ধর্ম জিনিসটা এদের কাছে একটা বেচাকেনার বস্তু, ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল কৌশল ও আয়োজন এদের আয়ত্তাধীনে। দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা, এদের ঠকানো খুব সহজ, বিশেষত ধর্মের ব্যাপারে।

যাক ও-সব কথা। আমি ধুনি-জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলুম, ইন্‌সিওরেন্সের দালাল দেখলুম, দৈব ঔষধের মাদুলি-বিক্রেতাকে দেখলুম, সাধুবেশী ভিক্ষুক দেখলুম—সত্যিকার সাধু একটাও দেখলুম না।

এ অবস্থায় বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে একদিন আশ্রয় নিয়েছি, শীতকাল, আমি বনের ডালপালা কুড়িয়ে আগুন করবার যোগাড় করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একজন শ্যামবর্ণ, ঋজু ও দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ় সাধু দেখি একটা পুঁটুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন। আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম।

সাধুটি বেশ মিষ্টভাষী, বললেন—তুই যে দেখছি বড় ভক্ত! কি চাস্ এখানে? বাড়ি ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়েছিস!

আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে বলতে গেলুম—রাগ নয় বাবাজী, বৈরাগ্য—

সাধুজী হেসে বললেন, যে কথাটি পাগলীও বলেছিল—ওহে ছোকরা, সাধু হব বললেই হওয়া যায় না। তার মধ্যে ভোগের বাসনা এখনও পুরোমাত্রায় রয়েছে। সংসারধর্ম কর্ গেযা।

মন্দির থেকে কিছু দূরে ছাতিম গাছের তলায় সাধুর পঞ্চমুণ্ডির আসন—পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরি। সাধু রাত্রে সেখানে নির্জনে সাধনা করেন তাও দেখলুম। মনে ভারী শ্রদ্ধা হল, সংকল্প করলুম এ মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনে এবার।

কিছুদিন লেগে রইলাম তাঁর পিছনে। তাঁর হোমের কাঠ ভেঙে এনে দিই, তিন মাইল দূরের কুসুমবনী বলে গ্রাম থেকে তাঁর চাল-ডাল কিনে আনি। গ্রামের সকল লোকের মুখে শুনলুম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক। অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তাঁর জানা আছে। তবে পাগলীর কাছে যেতে লোকে যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছিল—এখানেও তেমনি ভয় দেখালে। বললে—তান্ত্রিক সাধু-সন্নিসিদের বিশ্বাস করো না বেশি।ওরা সব পারে, একটু সাবধান হয়ে চ'লো। বিপদে পড়ে যাবে।

শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা একদিন বুঝলুম।

গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সেদিন শুক্লপক্ষের রাত্রি, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না। মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজী কার সঙ্গে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে কথা বলছেন। কৌতূহল হল—এত রাত্রে কে এল এই নির্জন নদীতীরের জঙ্গলের মধ্যে?

কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলুম। অল্প দূর গিয়েই যা দেখলুম তাতে আর এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

সাধু বাবাজী এত রাত্রে একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলছেন—গাছের আড়াল থেকে মেয়েমানুষটিকে খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখে আমার মনে হল মেয়েটি যুবতী এবং পরমা সুন্দরী।

এত রাতে গুরুদেব কোন্ মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, সে মেয়েটি এলই বা কেমন করে একা এই নির্জন জায়গায় ?

যাই হোক আর বেশিদূর অগ্রসর হলেই ওরা আমায় টের পাবে। মনে কেমন ভয়ও হল, সেদিন চলে এলুম। তার পরদিন রাত্রে আমি ঘুমুলাম না।গভীর রাত্রে উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি কাল রাতের সে মানুষটি আজও এসেছে। ভোর হবার কিছু আগে পর্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলাম দাঁড়িয়ে। ফরসা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আর সাহস হল না—মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই।

একদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। যে মেয়েমানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে তার পরনের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরনের। সে যে কোন্ দেশের বস্ত্র পরেছে সেটা না শাড়ি, না ঘাঘরা, না জাপানী কিমোনো, না মেমেদের গাউন!—অজানা যদিও, ভারী চমৎকার মানিয়েছেও বটে।

সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হল।

মেয়েমানুষটি যেই হোক, সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি। কি করে আমার একথা মনে হল তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই কথা আব্ছা ভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটু ভয়ও হল।

সরে পড়ি বাবা, দরকার কি আমার এসবের মধ্যে থেকে?

কিন্তু পরদিন রাত্রে এক সময়ে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে—উঠে যেতেই হল। সেদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম—মেয়েমানুষটি যখন থাকে, তখন এক ধরনের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া

যায়—এ ক'দিনও এই গন্ধটা পেয়েছি, কিন্তুভেবেছিলুম কোনও বন্য ফুলের গন্ধ হয়তো।আজ বেশ মনে হল এ গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্তমান।

এই রকম চলল আরও দিন-দশ-বারো।তার পরে সাধুর ডাক এল বরাকর না কোডার্মার এক গাড়োয়ালী জমিদারবাড়িতে কি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্যে। সাধুজী প্রথমে যেতে রাজী হন নি, দু-দিন তাদের লোক ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু তৃতীয়বারে জমিদারের ছোট ভাই নিজে পালকি নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোশামোদ করে নিয়ে গেলেন।

মনে ভাবলুম এ আর কিছু নয়, সাধুজী সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে রাজী নন।

কিন্তু নিকটে কোথাও বস্তি নেই, মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে? আর সাধারণ সাঁওতাল বা বিহারী মেয়ে নয়—আমি অনেকবার দেখেছি মেয়েটিকে এবং প্রত্যেক বারই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এ কোন বড়ঘরের মেয়ে, যেমনি রূপসী, তেমনি তার অদ্ভুত ধরনের অতি চমৎকার এবং দামী পরন-পরিচ্ছদ।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্টুবুদ্ধি জাগল। আমার মনে হয়েছিল মেয়েটিকে সাধুজীর হয়তো খবর দেওয়ার সুযোগ হয় নি—দেখাই যাক না আজ রাত্রে আসে কিনা ? তখন ছিল অল্প বয়েস, তোমরা যাকে বল রোমান্স, তার ইয়ে তখন যে আমার যথেষ্ট ছিল, এতে তুমি আমাকে দোষ দিতে পার না।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে রইলাম। মনে ভয়ানক কৌতূহল, দেখি আজ মেয়েটি আসে কিনা। কেউ কোন দিকে নেই, নির্জন রাত্রি, মনে একটু ভয়ও হল—এ ধরনের কাজ কখনও করিনি, কোন হাঙ্গামায় আবারপড়ে না যাই!

তখন আমি অপরিণতবুদ্ধি নির্বোধ যুবক মাত্র, তখন ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম অজ্ঞাতসারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি, তবে কি আর ছাতিমাতলায় একা পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে যাই?

তাও নয়, ও আমার অদৃষ্টের লিপি। সে-রাত্রির জের আমার জীবনে আজও মেটে নি। আমার মনের শান্তি চিরদিনের জন্যে হারানোর সূত্রপাতটি ঘটেছিল সেই কালরাত্রে—তা কি আর তখন বুঝেছিলাম!

যাক্ ও-কথা।

রাত ক্রমে গভীর হল। পুব দিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগল একটু একটু করে। আমার ডাইনেই বরাকর নদী, দুই পাড়েই শিলাখণ্ড ছড়ানো, তার ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ল। সেই নদীর পাড়েই ছাতিমতলা ও পঞ্চমুণ্ডির আসন—আমি যেখানে বসে আছি। আমার বাঁদিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ—তার পর শালবন শুরু হয়েছে।

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম। আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে, এমন অতর্কিত ভাবে যে আমি একেবারেই কিছু টের পাই নি! অথচ আগেই বলেছি আমার একদিকে বরাকর নদীর জ্যোৎস্না-ওঠা শিলাবিস্তৃত পাড়, আর একদিকে ফাঁকা মাঠ। আসনে বসে পর্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি—মাঠের দিকে। নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো আসা সম্ভব নয়—মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে আধ সেকেন্ড আগেও কেউ ছিল না আমি জানি, আধ সেকেন্ড পরেই সেখানে জলজ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালের মত ঠেকল বলেই আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু-মধুর সুগন্ধ! আমার সারা দেহ-মন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।...আমার জ্ঞানও বোধ হয় ছিল তার পর আর এক সেকেন্ড। তার পরে কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না।

যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এল তখন ভোর হয়ে গিয়েছে। উঠে দেখি সারা—রাত সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম। নৈশ শীতল বায়ুতে বাইরে সারারাত পড়ে থাকার দরুন গায়ে ব্যথা

হয়েছে, গলা ভার হয়েছে। উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চলে এলাম। এসে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার মনে হল আমার জ্বর হবে, শরীর এত খারাপ।

পরদিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রইলাম আর কেবলই কাল রাত্রের কথাটা ভাবি।

মেয়েটি কে? কি করে অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এল? এ তো একেবারে অসম্ভব। অসামান্যা রূপসী যে মেয়েটি, অজ্ঞান হয়ে পড়বার পূর্বে ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা আমি দেখে নিয়েছিলুম। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লামই বা কেন, এরও তো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না! অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করাও সারাদিন আমার ঘুচল না। বিকেলের দিকে সাধুবাবাজী গাড়োয়ালী জমিদার—বাড়ি থেকে ফিরলেন। আমার জন্যে লাড্ডু, কচৌড়ি এবং একটা মোটা সুতি-চাদর এনেছেন—তার নিজের জন্যে জমিদারবাড়ি থেকে ভাল একখানা পশমী আলোয়ান দিয়েছে।

আমায় বললেন—শুয়ে কেন? ওঠ—জিনিসগুলো রেখে দাও—

অতিকষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পুঁটুলিটা নিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন— কি হয়েছে?...অসুখ-বিসুখ নাকি?

কিছু জবাব দিলাম না।

সাধু স্নান করতে গেলেন এবং এসে জমিদার—বাড়ির কাণ্ড কি রকম তারই সবিস্তার বর্ণনা করতে লাগলেন। আমায় বললেন—তোমার কি হয়েছে বল তো? অমন মনমরা ভাব কেন ? বাড়ির জন্যে মন-কেমন করছে বুঝি? বলেছি তো বাবা, তোমরা ছেলে-ছোকরা, এ-পথে কি নামলেই নামা যায় রে বাপু! বড় কঠিন পথ!

সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এল। কত দিন ঠিক জানি না—অজ্ঞান অচৈতন্য রইলাম। জ্ঞান হলেই দেখতাম সাধু শিয়রে বসে আছেন।বোধ হয় তাঁরই সেবাযত্নে এবং দয়ায় সেবার ক্রমে সেরে উঠলাম।

সেরে উঠে একদিন গাছতলায় বসেছি দুপুরের পরে, সাধু বললেন—ছেলেছোকরা কিনা, কি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেছিলে বাপু! এবার তো বাঁচতে না—অতিকষ্টে বাঁচাতে হয়েছে। আচ্ছা বাপু, পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি জন্যে গিয়েছিলে সেদিন রাত্রে ?

আমি তো অবাক! কি করে জানলেন ইনি? আমি তো কোন কথাই বলি নি। হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, সেই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধুর ফিরে এসে দেখা হয়েছে, সে-ই বলেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—ভাবছ আমি কি করে জানলাম, না?..আরে বাপু, কতটুকুই বা তোমরা বোঝ, আর কতটুকুই বা তোমরা জান। তোমাদের দেখে দয়া হয়।

ভয়ে ভয়ে বললাম—আপনি জানলেন কি করে?

সাধু হেসে বললেন—আরে পাগল, তুমিই তো জ্বরের ঘোরে বলছিলে ঐসব কথা— নইলে জানব কি করে? যাক, প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের। আর কখনও অমন পাগলামি করতে যেও না।

আমি চুপ করে রইলাম। তা হলে আমিই বিকারের ঘোরে সব ফাঁস করে দিয়েছি!...সেইদিন মনে মনে সংকল্প করলাম, দু-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব— শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই।

কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্য রকম। সাধুবাবাজীকে তার পরদিন পাহাড়ী বিচ্ছুতেকামড়াল—তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন।আমি পাঁচ মাইল দূরবর্তী মিহিজাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনি, তাঁর সেবা করি, দিনরাত জেগে তিন দিন পরে তাঁকে সারিয়ে তুলি।

দিন-দশেক পরে আমি একদিন বললুম—সাধুজী, আমি আজ চলে যেতে চাই।

সাধু বিস্মিত হয়ে বললেন—চলে যাবে? কোথায়?

—এখানে থেকেই বা কি হবে? আমার তো কিছু হচ্ছে না—মিছে বসে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসানো! দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে বসে নেই?

সাধুজী চুপ করে গেলেন, তখন কোন কথা বললেন না।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন। বললেন—ভেবেছিলাম এ-পথে নামাব না তোমায়। কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছ, সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ, নিজের ছেলের মত সেবা করেছ, তোমাকে কিছু দিতে চাই। একটা কথা তার আগে বলি, তোমার সাহস বেশ আছে তো? .

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ।এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র-সাধনা করেছি।

তারপর আমি সেই শ্মশানের পাগলী ও তার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা বললাম—এতদিন পরে আজ প্রথম সাধুকে পাগলীর কথা বললাম।

সাধু অবাক হয়ে বললেন—সে পাগলীকে তুমি চেন? আরে সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়ে এসেছ সে কেবল তোমার পূর্বজন্মের পুণ্য। ওর নাম মাতু পাগলী, মাতঙ্গিনী। ও নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রে ভয়ানকভাবে সিদ্ধ। ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে! কি সর্বনাশ! ওকে আমরা পর্যন্ত ভয় করে চলি—কি রকম জান? যেমন লোকে ক্ষ্যাপা শেয়াল-কুকুর কি গোখ্‌রো সাপকে ভয় করে, তেমনি—ও সেই জাতীয়। অসাধারণ ক্ষমতা ওর নিম্নতন্ত্রের। ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত, সে একদিন বলব। কত দিন ওর সঙ্গে ছিলে?

—প্রায় দু-মাস।

সাধুজী বললেন—যখন ওর সঙ্গে ছিলে, তখন কিছু কিছু অধিকার হয়েছে তোমার। তোমাকে আমি মন্ত্র দেব। কিন্তু তুমি যুবক, তোমার মনের ভাব আমি জানি। তুমি কি জন্যে রাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়েছিলে বল তো?

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। মনের গোপন পাপ নেই, যদি পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে থাকি তবে সেই অপরিচিতা নিশাবিহারিণী রূপসীর টানে যে, এ-কথা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে!

সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমায় বললেন।

বললেন—কিন্তু একটা কথা তুমি জান না, সেটা আগে বলি। তুমি সেদিন যাঁকে রাত্রে ছাতিমতলায় বসে দেখেছিলে, তিনি তোমার আমার মত দেহধারী মানুষ নন।

শুনে তো মশাই আমার গা শিউরে উঠল—দেহধারী জীব নয়, বলে কি রে বাবা! তবে কি ভূত-পেত্নী নাকি?

সাধুজী বললেন—তোমায় একথা বলতাম না, যদি না শুনতাম যে তুমি মাতু পাগলীর সঙ্গে ছিলে! আচ্ছা শুনে যাও। আমার গুরুদেব ছিলেন ৺কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, হুগলী জেলায় জেজুড় গ্রামে তাঁর মঠ ছিল। মস্ত বড় সাধক ছিলেন, কুলার্ণব আর মহাডামর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রে তাঁর সমান অধিকার ছিল। মহাডামর-তন্ত্রের একটি নিম্নশাখার নাম ভূতডামর। আমি তখন যুবক, তোমারই মত বয়েস—স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূতডামরের ওপর। গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ও-পথ থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন— কিন্তু তাই কি হয়, অদৃষ্টলিপি তবে আর বলেছে কাকে? এই তোমার যেমন—

আমি বললাম—ও-পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন?

—ও-পথ প্রলোভনের পথ, বিপদের পথ। ভূতডামর তন্ত্র নানাপ্রকার অশরীরী উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে—তন্ত্রের ভাষায় এদের সাধারণ নাম যোগিনী। জপে ও সাধনায় বশীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে-কেউ—যার সাধনা তুমি করবে—সে তোমার আপন হয়ে থাকতে পারে। নানা ভাবে এদের সাধনা করা যায়, কিঙ্কিণী দেবীকে মাতৃভাবে পেতে হয়, কনকবতী দেবীকে পাওয়া যায় কন্যাভাবে—কিন্তু বাকি সব যোগিনীদের যে-কোন

ভাবে সাধনা করা যায় এবং যে-কোন ভাবে পেতে পারা যায়। এই সব যোগিনীদের কেউ ভাল কেউ মন্দ। এঁদের জাতি নেই বিচার নেই ধর্ম নেই, কোন গণ্ডি বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে এঁরা আবদ্ধ নন। ভূতডামরে এই সাধনার ব্যাপারে বলে দেওয়া আছে। ভূতডামরে প্রথম শ্লোকই হল—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধনোত্তমম্।

সর্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্বসিদ্ধিদম্

অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানমপি দুর্লভা

তুমি সেদিন যাঁকে দেখেছিলে তিনি এই রকম একজন জীব। তোমার সাহস থাকে সে—মন্ত্র আমি তোমায় দেব। কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোন তবে এ-পথে নেমো না।

এতটা বলে সাধুজী ভাল করেন নি, আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় আর কি সামলে রাখতে পারেন? আমি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লাম, মন্ত্র নেবই।

সাধুজী বললেন—তবে কনকবতী দেবী-সাধনার মন্ত্র নাও—কন্যাভাবে পাবে দেবীকে—

আমি চুপ করে রইলুম।

তিনি আবার বললেন—তবে কিঙ্কিণী-সাধনার মন্ত্র ?

আঃ, কি বিপদেই পড়েছি বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে। অন্য যোগিনীদের দেখতে দোষ কি?

সাধু আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—বেশ, আমি তোমাকে মধুসুন্দরী দেবীসাধনার মন্ত্র দিচ্ছি। এঁকে কন্যাভাবে, ভগ্নীভাবে বা ভার্যাভাবে পেতে পার। তবে আমার যদি কথা শোন, কখনও ভার্যা ভাবে পেতে যেও না। এর বিপদের দিক বলি : ভার্যাভাবে সাধনা করলে তিনি তোমাকে প্রণয়ীর মত দেখবেন—কিন্তু এঁরা মহাশক্তিশালিনী যোগিনী, সাধারণ মানবী নয়, এঁদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শক্ত। হয় তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ করে রাখবে, নয়তো একেবারে উন্মাদ করে ছেড়ে দেবে। সামলাতে পারা বড় কঠিন।

সাধুজী আমায় মন্ত্র দিলেন এবং বললেন—বাবা, এ জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে। তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারি নে। এক জায়গায় দু-জন সাধকের সাধনা হয় না।

বেশ ভাল।আমিও তা চাই নে। আমার ভয় ছিল, হয়তো সাধুজীও মাতু পাগলীর মত হিপ্‌নটিজম্ জানে, এবং খানিকটা অভিভূত করে যা-তা দেখাবে আমায়। তারপর—

আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—কেন, আপনি যে স্বচক্ষে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি মূর্তি দেখেছিলেন, তখন তো সাধু সেখানে ছিলেন না?

—তারপর আমার টাইফয়েড জ্বর হয়, বলি নি? হয়তো পঞ্চমুণ্ডির আসনে যখন বসে, তখনই জ্বর আসছে, সে-সময় জ্বরের পূর্বাবস্থায় অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকব—হয়তো চোখের ধাঁধা। জ্বর ছেড়ে সেরে উঠে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল, সত্যি বলছি।

যাক সেকথা। তারপর সেখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীর ধারে আর একটা নির্জন জায়গায়। ওখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে, থাকতাম গ্রামের বারোয়ারী ঘরে। গ্রামের লোকে যে যা দিত তাই খেতাম, আর সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে নির্জনে বসে মন্ত্র জপ করতাম।

এই রকমে এক মাস কেটে গেল, দু মাস গেল, তিন মাস গেল কিছুই দেখিনে। মন্ত্রের উপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে। তবুও মনকে বোঝালাম—ছ মাস পরে পূর্ণাহুতি ও হোম করার নিয়ম বলে দিয়েছিল সাধুজী,

তার আগে কিছু হবে না।ছ মাসও পূর্ণ হল। সাধুজী যেমন বলে দিয়েছিল, ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করলাম।

পদ্মাসনং সমাস্থায় মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্মতম্।

আমিষান্নৈঃ পুপসূপৈঃ সংপূজ্য মধুসুন্দরী।

বরাকর নদীর তীরে বসে ভাত রাঁধলুম, কই মাছ পোড়ালুম, আঙটপাতার পাতায় ভাত ও পোড়ামাছের নৈবিদ্যি দিলাম।ডুমুরের সমিধ দিয়ে বালির উপর হোম করে ওঁ টং ঠং ঋং হুঁ ক্ষং মধুসুন্দর্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রে আহুতি দিলাম। জাতিফুলের মালা নিতান্ত দরকার, কত দূর থেকে খুঁজে জাতিফুলের মালা এনেছিলাম—তার মালা ও চন্দন আলাদা কলার পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করে ধ্যানে বসলাম—সারারাত কেটে গেল।

বললাম কিছু দেখলেন?

—কা কস্য পরিবেদনা! ঘি, চন্দন, মিষ্টি কিনতে কেবল কতকগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। ধ্যান-জপ-হোমে কিছুই ফল ফললো না। রাগ করে টান মেরে সব নৈবিদ্যি ফেলে দিলাম নদীর জলে।বেটা সাধু বিষম ঠকিয়েছে। কোনো ব্যাটার কোনো ক্ষমতা নেই—যেমন মাতু পাগলী তেমনি এ সাধু। তন্ত্রটন্ত্র সব বাজে, খানিকটা হিপ্‌নটিজম্ জানে—তার বলে মূর্খগ্রাম্যলোককে ঠকিয়ে খায়।

এ-সব ভাবি বটে, জপটা কিন্তু ছাড়তে পারিনি, অভ্যেসমত করেই যাই, ওটা যেন একটা বদ-অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এ-ভাবে আরও মাস চার-পাঁচ কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার পরেই, রাত তখন হয়েছে সবে, আধ ঘণ্টাও হয়নি। আমি একটা গাছের তলায় বসে জপ করছি, অন্ধকার হলেও খুব ঘন হয় নি তখনও—হঠাৎ তীব্র কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করলাম বাতাসে। বেশ মন দিয়ে শুনে যাও। এক বর্ণও মিথ্যে বলি নি। যা যা হলএকটার পর একটা বলছি মন দিয়ে শোন। কস্তুরীর গন্ধটা যখন সেকেন্ড চার-পাঁচ পেয়েছি তখন আমার সেদিকে মন গেল। ভাবলুম এ দেখছি অবিকল কস্তুরী গন্ধ! বাঃ, পাহাড়ে জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা বনফুলই আছে!

তারপরেই আমার মনে হল আমার পেছনে অর্থাৎ যে-গাছটার তলায় বসে ছিলাম তার গুঁড়ির আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। আমি পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না দেখেও এভাবে ধরা যায়। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হল্‌ক বেরুচ্ছে মনে হল। আবার অজ্ঞান হয়ে যাবো নাকি? ভয় হল মনে। ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। আধ সেকেন্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন না। ঠিক সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসার রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করলাম, জ্ঞান হারাব না কখনই।

মেয়েটি দেখি ঈষৎ ভ্রূকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—নিজের চোখে এমনি এক মূর্তি দেখলেন আপনি?

আমার কথার মধ্যে হয়তো একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পাইয়া তারানাথ উগ্র প্রতিবাদের সুরে বলিল—নিজের চোখে।সুস্থ শরীরে। বিশ্বাস কর আর না-কর সে আলাদা কথা—কিন্তু যা দেখেছি তাকে মিথ্যে বলতে পারব না।

—কি রকম দেখলেন? কেমন চেহারা?

—ভারী রূপসী যদি বলি কিছুই বলা হল না।মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যানে আছে :

উদ্যদ্ ভানু প্রতীকাশা বিদ্যুৎপুঞ্জনিভা সতী

নীলাম্বরপরিধানা মদবিহ্বললোচনা

নানালঙ্কারশোভাঢ্যা কস্তুরীগন্ধমোদিতা

কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং পীনোতুঙ্গপয়োধরাম্।

অবিকল সেই মূর্তি। তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মনগড়া কথা নয়, সাধকে প্রত্যক্ষ করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—আপনি কোন কথা বললেন?

—কথা! আমার চেতনা তখন লোপ পাবার মত হয়েছে—তো কথা বলছি! পাগল তুমি? সে-তেজ সহ্য করা আমার কর্ম? সাধারণ মানবীর মত তার কোন জায়গাই নয়। ঐ যে বলেচে মদবিহ্বললোচনা—ওরে বাবা, সে চোখের কি ভাব! ত্রিভুবন জয় হয় সে-চোখের চাউনিতে।...

আমি অধীর হইয়া বলিলাম—বর্ণনা রাখুন। কি কথা হল বলুন।

—কথাবার্তা যা হয়েছিল সব বলার দরকার নেই।

মোটের উপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাত্রে আমায় দেখা দিতেন। নদীতীরের সেই নির্জন জায়গায় তাঁকে চেয়েছিলাম প্রিয়ারূপে—বলাই বাহুল্য, সাধুর কথা কে শোনে? তখন শীতকাল, বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক, জলের ধারে জলজ লিলিগাছ শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে এসেছে, আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে বালির উপর অভ্রকণা জ্যোৎস্নারাত্রে চক্‌চক্ করে, বরাকর নদীর দু'পারের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে। আকাশ রোজ নীল, রাত্রে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার বড় মনোরম শোভা—সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতি রাত্রে দেখা দিতেন—সত্যিকার বাঁচা বেঁচেছিলাম ঐ তিন মাস। এসব কথাও বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। কত বেদনাদায়ক তুমি জান না, আমার জীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তা পেয়েছিলাম ঐ তিন মাসে। দেবীই বটে, মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালবাসা, অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা—সে এক স্বর্গীয় দান...সে তুমি বুঝবে না, তোমায় কি বোঝাব, তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে, মিথ্যেবাদী না হয় পাগল ভাববে। হয়ত ভাবছ এতক্ষণ। তুমি কেন আমার স্ত্রীই আমার কথা বিশ্বাস করে না, বলে, আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল করে দিয়েছিল গুণজ্ঞান করে।

কিন্তু সে সুখের প্রকৃতি ভীষণ মদিরার মত। আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ করে দিতে লাগলো। কিছু ভালো লাগে না। কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে বরাকর নদীর শালবনে, কখন দেবী মধুসুন্দরী নায়িকার বেশে আসবেন। সারারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাবে স্বপ্নের মত, নেশার ঘোরের মত। আকাশ, নক্ষত্র, দিক্‌বিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্যে—কয়েক প্রহরের জন্যে সময় স্থির হয়ে নিশ্চুপ হয়ে স্থাণুর মত অচল হয়ে থেমে থাকবে বরাকর নদীতীরের বনপ্রাঙ্গণে।

একদিন ঘটল বিপদ।

একটি সাঁওতালী মেয়ে রোজ নদীর ঘাটে জল নিতে আসে—সুঠাম তার দেহের গঠন, নিকটেই বস্তিতে তার বাড়ি। অনেক দিন থেকে তাকে দেখচি, সেও আমায় দেখচে।

সেদিন সে জল নিয়ে ফিরে যাচ্চে। আমায় তাদের বাঁকা বাংলায় বল্লে—ছেলে হয়ে হয়ে মরে যায়, তার মাদুলি আছে তোমার কাছে সাধুবাবা?

এমন ভাবে করুণ সুরে বল্লে—আমার মনে দয়া হল। মাদুলি দিতে জানি একথা বলিনি, তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম। তারপর সে চলে গেল।

মধুসুন্দরী দেবীকে সেদিন দেখলুম অন্য মূর্তিতে। কি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি, কি ভীষণ মুখের ভাব! সে মুখের ভাব তুমি কল্পনা করতে পারবে না—চণ্ডিকা দেবীর রোষকটাক্ষে যেমন লোলজিহ্বা, করালিনী প্রচণ্ডা কালভৈরবী মূর্তির সৃষ্টি হয়েছিল—এও যেন ঠিক তাই।

সেদিন বুঝলুম আমি যার সঙ্গে মেলামেশা করি, সে মানুষ নয়—মানুষের পর্যায়ে সে পড়ে না। মানবী রাগ যতই করুক সে করালিনী হয় না, পিশাচী হয় না—মানবীই থেকে যায়।

ভীষণ পূতিগন্ধে সেদিন শালবন ভরে গেল—প্রতিদিনের মত কস্তুরীর সুবাস কোথায় গেল মিলিয়ে। তারপর এলেন মধুসুন্দরী দেবী—দেখেই মনে হল এরা দেবীও বটে, বিদেহী পিশাচীও বটে। এদের ধর্মাধর্ম নেই, সব পারে এরা। যে হাতে নায়িকার মত ফুলের মালা গাঁথে, সেই হাতেই বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুশোচনায় নিমেষে ধ্বংস করতে এরা অভ্যস্ত।

আমার ভীষণ ভয় হল।

পিশাচী মধুসুন্দরী তা বুঝে বল্লে—ভয় কিসের?

বল্লুম—ভয় কই? তুমি রাগ করেছ কেন?

খল খল অট্টহাস্যে নির্জন অন্ধকার ভরে গেল। আমি শিউরে উঠলাম।

পিশাচী বল্লে—শব চিনতে পারবে? অন্ধকার রাত্রে সাঁওতালদের কোনো বৌয়ের শব তোমার সামনে দিয়ে যদি জলে ভেসে যায়—চিনতে পারবে? তুমি না যদি চিনতে পারো, দুটি শবে জড়াজড়ি করে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে।

হাত জোড় করে বল্লুম—দেবি, তোমায় ভালবাসি। ও মূর্তি আমায় দেখিও না—আমায় মারো ক্ষতি নেই—কিন্তু অন্য কোন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকের প্রাণ কেন নেবে? দয়া করো।

বহু চেষ্টায় প্রসন্ন করলুম। তখন আবার যে দেবী, সে দেবী। বল্লেন—সেই সাঁওতালের মেয়ের মূর্তিতে আমায় দেখতে চাও? সেই মূর্তিতে এখনি দেখা দেবো!

বলতে বলতে সেই সাঁওতালদের মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বরং আরও নিটোল গড়ন শরীরের, মুখের ভাব আরও কমনীয়।

বললুম—ও চাই না—তোমার মূর্তি দেখাও দেবী।

সেই রাত্রি থেকে বুঝলুম কালসাপ নিয়ে খেলা করছি আমি। গুরুদেব বারণ করেছিলেন এই জন্যেই। হয়তো একদিন মরবো এর হাতেই। সাপুড়ে সাপ খেলায় মন্ত্রে— আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছোবলেই মরে। এ ভাব বেশীদিন কিন্তু ছিল না। কিছুদিন পরে পিশাচী মূর্তি ভুলে গেলুম দেবীর অনুপম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে। তাতেও বুঝলুম এ সাধারণ মানবী নয়—অমানুষিক ধরনের এদের মন। মানুষের বিবর্তনের জীব এরা নয়। হয় তার ওপরে, নয় তার নীচে।

একদিন দেবী আমায় বল্লেন—আর কিছুদিন যাক, তোমায় বহুদূর নিয়ে যাবো—

—কোথায়?

—সে বলবো না এখন।

—কত দূরে? কোন্ দিকে?

—এত দূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তবে তোমার ভাগ্যে আছে কি তা?

সব ভুলে গেলাম আবার। পিশাচিনী মধুসুন্দরী তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে—আমার সামনে হাস্যলাস্যময়ী, যৌবনচঞ্চলা, মুগ্ধস্বভাবা অপরূপ রূপসী এক তরুণী নারী। দেবীই বটে।

আমি আবার কিসের নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লুম, মাথার ঠিক রইল না।

একদিন বললেন—বিপদ আসচে তোমার, তৈরি হও।

—কি বিপদ?

—তা বলবো না।

—প্রাণ-সংশয়ের বিপদ?

—তা বলবো না।

—তুমি অভয় দিলে বিপদ কিসের?

—আমি ঠেকাতে পারবো না। কেউ ঠেকাতে পারবে না। যা আসছে, তা আসবেই।

কথা খেটে গেল শিগ্‌গির, খুব বেশী দেরি হয়নি।

তিন মাস পরে আমার বাড়ি থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির। গ্রামের লোক তাদের বলেছে কে একজন পাগল, বোধ হয় বাঙালীই হবে, অল্প বয়েস, বরাকর নদীর ধারে শালবনে সন্ধ্যাবেলা বসে থাকে—আর আপনমনে বিড় বিড় করে বকে। আমায় এ অবস্থায় গাঁয়ের অনেকেই নাকি দেখেছে।

তাই শুনে বাড়ির লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করলে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় জট, গায়ে খড়ি উঠছে—এই অবস্থায় নাকি আমায় ধরে। বাড়ি ধরে আনবার জন্যে টানাটানি, আমি কিছুতেই আসব না, ওরাও ছাড়বে না।আমার তখন সত্যিই জ্ঞান নেই, সত্যিই আমি ক্ষিপ্ত, উন্মাদ। ওরা হয়তো আমায় আনতে পারত না—কিন্তু যে দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়িনীরূপে, তিনি নিরুৎসাহ করলেন।

—কি রকম?

—ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের একটি গোয়ালঘরে আমায় বেঁধে রেখেছিল। গভীর রাত্রে বাঁধন ছিড়ে ওদের হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দেবীকে বললাম—আমি এই নদীতীরের তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন—যেতে হবেই, এই আমার অদৃষ্টলিপি। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন না। তিনি জানেন, এই রাতের পরে জীবনে তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। আগে থেকে বলে তৈরি করে রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্যেই।

দেবী ত্রিকালজ্ঞা, তাঁকে জিজ্ঞেস করি কি করে তিনি একথা জানলেন। হলও তাই, বাড়ি আসার পরে সবাই বললে, কে কি খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে। দিনকতক উন্মাদের চিকিৎসা চলল—বছর খানেক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হল। সেই থেকেই আমি সংসারী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কখনো মন্ত্র জপ করে তাঁকে আহ্বান করেন নি কেন?

—বাপ রে! এ কি ছেলেখেলা! মারা যাব শেষে! অন্য নারী জীবনে এলে তিনি দেখা দেবেন? সে-চেষ্টাও কখনো করিনি। সে কতকাল হয়ে গেল, সে কি আজকার কথা?

—আচ্ছা, এখন আর তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে, উত্তেজনায় বালিশ বুকে দিয়ে খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল।

—ইচ্ছে হয় না কে বলেছে? বললুম তো, ঐ তিন মাসই বেঁচে ছিলাম। দেবী এসেছিলেন মানুষী হয়ে। এদিকে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী শক্তিরূপিণী যোগিনী, তেজে কাছে ঘেঁষা যায় না—অথচ কি মানবীই হয়ে যেতেন, যখন

ধরা দিতেন আমায়! প্রিয়ার মত আসতেন কাছে, অমনই মিষ্টি, অমনই ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান, বরাকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তাঁর মধুর হাসিতে জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠতো—এমনি কত রাত ধরে! এক-এক সময় ভ্রম হত তিনি সত্যিই মানুষী হবেন।

বিদায় নিয়ে যাবার সেই রাতটিতে বললেন—নদীতীরের এই তিন মাসের জীবন আমিও কি ভুলবো ভেবেছ! আমাদের পক্ষেও সুলভ এ নয়, ভেবো না আমরা খুব সুখী। আমাদের মত সঙ্গীহারা, বন্ধুহারা জীব কোথায় আছে? প্রেমের কাঙাল আমরাও। কত দিন পরে একজন মানুষে আমাদের সত্যিকার চাওয়া চায়, তার জন্যে আমাদের মন সর্বদা তৃষিত হয়ে থাকে, কিন্তু তাই বলে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারিনে, আগ্রহ করে যে না চায় তার কাছে যাইনে, সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না, নিজেও আনন্দ পাবে না, যা কিনা পাওয়া যায় বহু চেয়ে পাওয়ার পরে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টলিপি; কোথাও চিরদিন থাকতে পারিনে—কি-না-কি ঘটে যায়, ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও।ক'জন আমাদের ডাকে? ক'জন বিশ্বাস করে? সুখী ভেবো না আমাকে।

বলিলাম—এত যদি সুখের ব্যাপার, তবে আপনি ভয়ঙ্কর বলেছিলেন কেন আগে?

—ব্যাপার ভয়ঙ্কর এই জন্যে যে আমার সারাজীবনটা মাটি হয়ে গেল ঐ তিন মাসের সুখভোগে। কোন দিকে মন দিতে পারিনে—মধ্যে তো দিন-কতক উন্মাদ হয়েই গিয়েছিলাম, বিয়ের পরেও। তারপর সেরে সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ করে যা হয় একরকম—সেও দেবীরই দয়া। তিনি বলেছিলেন, জীবনে কখনও অন্নকষ্টে আমায় পড়তে হবে না। পড়তে কখনও হয়নি— কিন্তু ওতেই কি আর আনন্দ দেয় জীবনে?

তারানাথ গল্প শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে যাইবার জন্য উঠিল। আমিও বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলাম। এত অদ্ভুত, অবাস্তব জগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলিয়াছিল ততক্ষণ ওর চোখমুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে নাই— কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই মনে হইল—

কি মনে হইল তাহা আর না-ই বা বলিলাম![1]

[1]তারানাথ তান্ত্রিকের প্রথম গল্প, বিভূতি-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য।